ধনধান্য

বার্ষিক পত্রিকা

গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, তেহট্ট

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪-২০২৫

ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং প্রোগ্রাম, ২০২৫

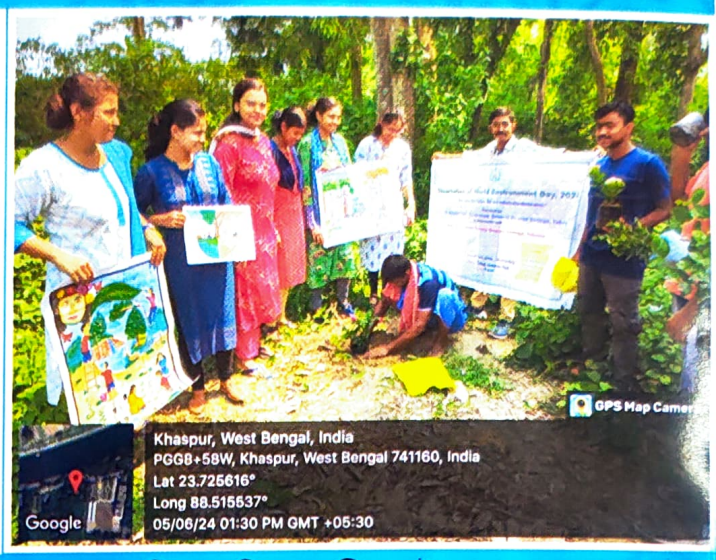

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন, ২০২৪

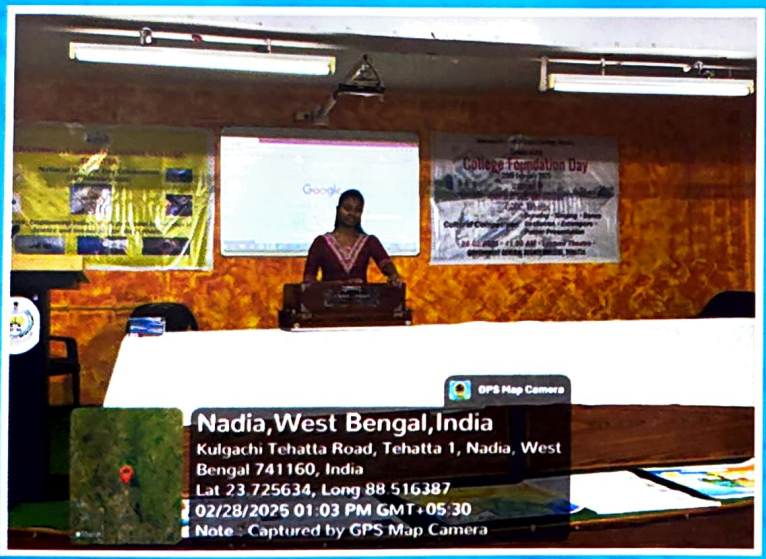

কলেজ প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন, ২০২৫

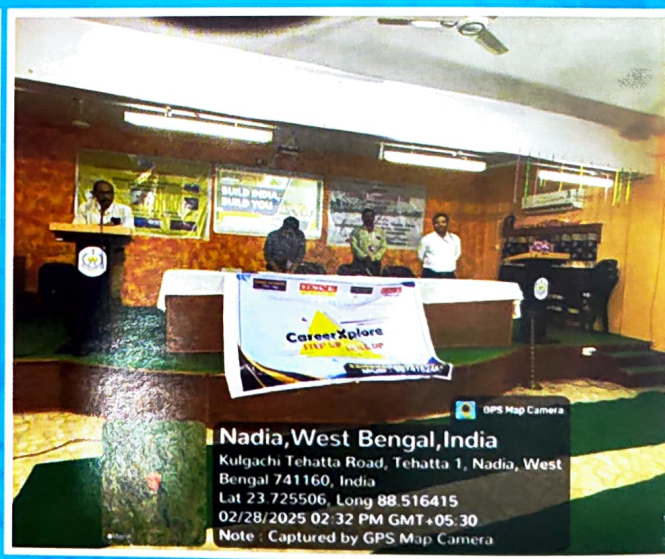

কলেজ প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন, ২০২৫

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পাঠরত শিক্ষার্থীরা

ধনধান্য

অষ্টম সংকলন ২০২৪-২০২৫

গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, তেহট্ট
তেহট্ট, নদিয়া, পিন-৭৪১১৬০

ধনধান্য

অষ্টম সংকলন ২০২৪-২০২৫

প্রকাশক ও সত্ত্বাধিকারী ঃ
ড. শিবশংকর পাল, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

প্রকাশকাল ঃ
২৫ বৈশাখ, ১৪৩২ সন

প্রচ্ছদ ঃ ড. শুভদীপ দেবনাথ

নামাঙ্কন ঃ
ড. শিবশংকর পাল

বর্ণ সংস্থাপনে ঃ
বাবাই বিশ্বাস

সম্পাদক ঃ
ডঃ আবুল কাশিম, সহকারী অধ্যাপক (গণিত বিভাগ)
প্রিয়া টুডু, সহকারী অধ্যাপক (দর্শন বিভাগ)

মুদ্রণে ঃ
আর্ট প্রেস
৭, সুভাষ এভিনিউ,
রাণাঘাট, নদীয়া।

গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, তেহট্ট
তেহট্ট, নদিয়া, পিন-৭৪১১৬০

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	লেখক/লেখিকা	পৃষ্ঠা নং
১	শুভেচ্ছা	ড. শিবশংকর পাল	১
২	মাতৃ ভ্রম	আজিজা খাতুন	৭
৩	সোনা মা	আজিজা খাতুন	৮
৪	থেকে যাও	রিমন শেখ	৮
৫	কবিতা	তিথি মণ্ডল	৯
৬	যেদিন আমি থাকবো না	তিথি মণ্ডল	৯
৭	নতুন ভোর	অনুষ্কা বিশ্বাস	১০
৮	মিসিবাব	মনালিকা বিশ্বাস	১১
৯	ভয় হয় মোর	আজিজা খাতুন	১১
১০	'আড্ডা'	শিনম মণ্ডল	১২
১১	বকুলতলার মহোৎসব	কৃষ্ণকান্তি হালদার	১৩
১২	প্রতিবাদের ভাষা বাংলা	সুরাইয়া সুলতানা	১৫
১৩	Empowering Women and Improving Social Indicators	Srijita Roy	১৭
১৪	Grow Up with me like a Plant	Suraiya Sultana	১৯
১৪	ঘটক মশাই	মুসকান রহমান	১৯
১৫	While Learning an Unfinished Work	Nisan Mondal	২০
১৬	TEACHING STAFF		২১

সম্পাদকীয়

গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রী কলেজ, তেহট্ট শুধুমাত্র একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও বটে। কলেজের শিক্ষার্থীরা পড়াশুনার উৎকর্ষের পাশাপাশি খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে থাকে। গত এক বছরে কলেজে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম, সেমিনার, বক্তৃতা কুইজ প্রতিযোগীতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং খেলাধুলার আয়োজন হয়েছে যা শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এবং তাদের সার্বিক উন্নতি ঘটাতে ব্যাপকভাবে সাহায্যে করেছে।

আমাদের কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকাগণের নিষ্ঠা এবং প্রতিশ্রুতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত উন্নতির মূলশক্তি। কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ তাঁদের অমূল্য অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উন্নতির পথে পথপ্রদর্শক হিসাবে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।

ধনধান্য পত্রিকার মাধ্যমে আমরা কলেজের সববিভাগ ও শিক্ষার্থীদের অর্জনকে সম্মান জানাই এবং তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে অর্জিত সাফল্যগুলি উৎযাপন করি। পাশাপাশি আমাদের লক্ষ্য হল আগামী বছরগুলেতে আমাদের আরো একত্রিতভাবে আমাদের কলেজের মর্যাদা ও সাফল্যকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

ধনধান্য পত্রিকার মাধ্যমে আমরা শুধু একাডেমিক অগ্রগতির কাহিনী নয় বরং আমাদের মানবিকতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সংস্কৃতির লালনকে তুলে ধরতে চাই। আমাদের বিশ্বাস ভবিষ্যতে এই পত্রিকা কলেজের ঐতিহ্য রক্ষা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এক বড় ভূমিকা পালন করবে।

যুগ্ম-সম্পাদক

ডঃ আবুল কাশিম

ও

প্রিয়া টুডু

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের শুভেচ্ছা বার্তা

ডিজিটাল যুগ: মূল্যবোধ ও কর্মজীবনের সংকট

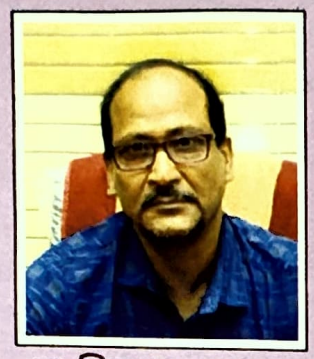

ড. শিবশংকর পাল

অদ্ভির্গাত্রাণি শুদ্ধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুদ্ধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাম ভূতাত্মা বুদ্ধি জ্ঞানেন শুদ্ধ্যতি।। [মনুসংহিতা, ৫/১০৯]
বাংলা অর্থ: জল দেহকে পরিচ্ছন্ন করে। চিত্ত সত্যের দ্বারা শুদ্ধ হয়। জীবাত্মার শুদ্ধি হয় বিদ্যা ও সাধনায়। আর বুদ্ধি শুদ্ধ হয় জ্ঞানের মাধ্যমে।

প্রতি বছর কলেজের বার্ষিক পত্রিকা 'ধনধান্য'তে অধ্যক্ষের শুভেচ্ছা বার্তা লেখা একটি প্রথা; এবং সেটি বেশ বিরক্তিকর। তবু প্রথা রক্ষা করতে হয়। কখনও কখনও প্রথা নিয়ম বা আনুষ্ঠানিকতা ভাঙতেও হয়। অবশ্যই নতুন কিছু করবার বা গড়বার জন্য। তাই এবারে একটা ব্যক্তিগত স্মৃতিকথন দিয়ে 'শুভেচ্ছা বার্তা' শুরু করি।

আমাদের মগজে যে বয়স থেকে স্মৃতির সংরক্ষণ শুরু হয়, আমার সেই শৈশবকালে মফস্বল শহরে দু'বেলা বাড়ি বাড়ি আঁচ পড়ত তোলা উনুনে। কয়লার ধোঁওয়ায় জ্বলতো পাড়ার চোখ। দু'একটা বড়োলোক বাড়ির ছাদে কাক-শালিকের বিশ্রামস্থল হিসেবে গর্বিত উদ্ধত অ্যান্টেনা জানান দিত তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থান। বাকিরা রেডিওতে বিনোদিত হতেন। দেবদুলালের খবর, পুষ্পেন সরকারের খেলার ধারাবিবরণী, অনুরোধের আসর, রবীন্দ্রসঙ্গীত, তর্জাগান, কৃষিকথা, সপ্তাহান্ত নাটক। আরও অনেক কিছু। আর পার্থ ঘোষের গল্পদাদুর আসর। এতেই আমরা মজে যেতাম। পড়াশুনো ফাঁকি দিয়ে রেডিও শুনলে বিস্তর বকাঝকা। মৃদু-মন্দ্র মারধোরও জুটত।

সাতের শেষে, আটের দশকের শুরুতেই ঘরে ঘরে এলো সাদাকালো টিভি। কারওর কারওর বাড়িতে রঙিন টিভি সঙ্গে রিমোট। ভোজবাড়িতে মাটিতে পাত পেড়ে খাওয়া ততদিনে উঠে গেছে। এসেছে দুটো তেপায়া বেঞ্চির উপর কাগজের রোল বিছিয়ে শালপাতায় খাওয়ার চল। মাটির ভাড়ের গ্লাস তখনও কুলোর বাতাসে উধাও হয়নি। বড়োরা রিক্সায় চড়ে সিনেমা হলে 'বই' দেখতে যেতেন। কদাচিৎ ছোটোদের বিষয়াশ্রিত 'বই' হলে রিক্সায় বড়োদের পায়ের কাছে বসে সিনেমা হলে গিয়ে 'বই' দেখার সৌভাগ্য হতো। এই ছিল সেকালে আমাদের মফস্বলে ঘরোয়া জীবনের দৈনন্দিন প্রযুক্তি ও বিনোদন। আর ছিল জন্মদিনে বই, বিয়ে বাড়িতে বই, বন্ধুদের বাড়িতে সিলেবাসের বাইরের বই, শুকতারা, আনন্দমেলা, সন্দেশ এসব পত্রিকা। এগুলি পেলে আমরা হাতে স্বর্গ পেতাম। প্রথমে বুকে জড়িয়ে ধরতাম। গন্ধ শুঁকতাম। তারপর নামপত্র থেকে শেষের পাতা পড়ে পড়ে মুখস্থ করে ফেলতাম।

আটের দশকের একদম শেষে এবং ন'য়ের শুরুতে আমাদের এই অভ্যস্ত জীবন অতি দ্রুত বদলে যেতে লাগলো। কী একটা গ্যাট চুক্তি হলো -- আজি দখিন দুয়ার খোলা বলে গান ধরলো সে-কালের কেন্দ্রীয় সরকার। অস্যার্থ ভারতের বাজার বিশ্বের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেল। অটোমেশনের অর্থাৎ কিনা কম্পিউটারের বিরুদ্ধে আমরা মৃদু ভাঙা স্বরে প্রতিবাদ করলাম বটে, তবে কিনা বিজ্ঞানকে ঠেকিয়ে তো লাভ নেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ঠেকালে ঠকার সম্ভাবনা বেশি। বরং তাকে গণকল্যাণে কাজে লাগাতে হয়। আমাদের দেশের খুড়ি রাষ্ট্রের পিতা-মাতারা আবার চলেন সর্বখেকো হাঙর-কুমিরদের টাকায় ও হুকুমে। ফলে যা হবার তা-ই হলো। তথ্য প্রযুক্তির হাত ধরে ঘরেতে বিশ্ব এলো হুড়মুড়িয়ে। তাকে আমরা না ঠেকাতে

পারলাম, না সাধারণ মানুষের কল্যাণে কর্মসংস্থান হলো। বিশ শতকের শেষ দশকটি তরতরিয়ে প্রাচ্যের দুয়ার খোলা হলো ও খোলা হাওয়ায় আমোদিত হতে হতে আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি-অর্থনীতি সহ ব্যক্তি মানুষের মগজ ও মননের অভিমুখ গেল সমূল বদলে। একুশ শতাব্দীর শুরুতেই মুঠোয় থাকা কথা বলার যন্ত্রটি আর বলা-কওয়ায় সীমাবদ্ধ থাকলো না। আঙুলের পরশে সে হয়ে উঠলো এক একটি কম্পিউটারের অধিক কিছু। এতটাই স্মার্ট যে নোটের ও নেটের ব্যালেন্স থাকলে দুনিয়াদারি আপনার হাতের মুঠোয়। বিনোদন থেকে বিদ্যার্জন -- স্মার্টফোন ছাড়া গতি নাহি আরা। মায় সে-কালের চণ্ডীমণ্ডপের অত্যাধুনিক সংস্করণ হিসেবে এসে গেল নানা কিসিমের সমাজমাধ্যম। এ এমন এক সমাজমাধ্যম যা আপনাকে রাজনীতি থেকে রান্নাঘর, দেহলি থেকে কদলি প্রদর্শন করার এবং তার থেকে উপার্জনের উপায় করে দেবে--আমরা কেউ ভেবেই উঠতে পারিনি। আমরা শিক্ষার্থীজীবনে ভাবতেই পারিনি যে, কন্টেন্ট-এর বাজার বসবে বিশ্বজুড়ে। হাতে আসবে তেল মাখার কড়ি। চাকরি-বাকরি চুলোয় যাবে।

আমাদের ইশকুল ও কলেজ বেলায় চাকরির স্বপ্ন বলতে ছিল কেন্দ্রের ব্যাঙ্ক, বীমা, বিমান, রেল, তেল আর ইউপিএসসি-র করণিক। আর রাজ্যক্ষেত্রে ছিল স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া নতুবা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার উদ্ধত কৌলিন্য। উচ্চপদের প্রশাসনিক চাকরিতে বাঙালির অনীহা তার ডিএনএ-তেই ছিল। সেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় থেকে। এ বিষয়ে নেতাজি সুভাষ আমাদের অগ্রদূত। তবু গ্রুপ-সি নিদেন গ্রুপ-ডি-তে আমাদের অনিচ্ছুক যোগদান থাকত। দশটা-পাঁচটার জীবন ছিল আমাদের স্বপ্নের নিয়তি। কিম্বা হয়তো নিয়তির স্বপ্ন। এখন যা পর্যবসিত হয়েছে দুঃস্বপ্নে।

নিয়তি বা স্বপ্ন যা-ই বলি না কেন, এখন তা ভেঙে চুরমার। বামনের চাঁদ হাতে পাওয়া। প্রথমত, ব্যাঙ্ক, বীমা, বিমান, রেল, তেল সহ রাষ্ট্রাধীন সকল ক্ষেত্রগুলি কতিপয় কর্পোরেট পুজির মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ্যে। বগল বাজিয়ে। অগণতান্ত্রিকভাবে। আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে, এঁদের প্রায় সকলেই একটি বিশেষ রাজ্যের বাসিন্দা। এবং একটি বিশেষ ধর্মীয় দলের বন্ড কেনে। চোরা পথে। সে চোরা পথ সামনে এলেও আমরা নিস্পৃহ থেকেছি তপস্যা রত সন্ন্যাসীর মতো। গা-বাঁচাতে বিশেষ গা করিনি। এই এড়িয়ে চলার ফলে গোটা দেশটাই এখন পরিচালিত হয় কর্পোরেট মালিকদের দ্বারা; যাঁদের আমরা রাজনীতির ভাষায় বলি ক্রোনি ক্যাপিটাল; মানে দুর্বৃত্ত পুজি। কেন্দ্রীয় সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠের ঔদ্ধত্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলি দুর্বৃত্ত পুজির হাতে সাদরে সাগ্রহে তুলে দিয়েছে। আর এ রাজ্যে পরিকল্পিত দুর্নীতির বাঁধ ভাঙা স্রোতে শিকেয় উঠেছে প্রায় সব ধরনের চাকরি। মুদিখানার দোকানের মতো এখানে চাকরি বেচাকেনা চলছে। আর আমরাও জ্ঞাতে অজ্ঞাতে অভাবের তাড়নায় এই দুষ্টচক্রের ফাঁদেই কেবল পা দিইনি; এই অবৈধ অনৈতিক কাজকে সামাজিক মান্যতা দিয়ে ফেলেছি। ফলে সরকারি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বেসরকারি হাতে চলে যাওয়ার দিন গুণছে। এবং চাকরিগুলো ক্রমশ তার সমস্ত মর্যাদা হারিয়ে হয়ে উঠছে অতি নিম্ন আয়ের উপার্জন। উপার্জন ও চাকরি তো এক নয়। চাকরিতে থাকে ন্যূনতম সম্মানজনক কিছু শর্তাবলি। বেসরকারি ক্ষেত্রে শর্তাবলি বলি প্রদত্ত হয়। আমরা দেখছি দারোয়ানের(শব্দটিকে অসম্মানজনক ভাববেন না কেউ) মাইনেতে শিক্ষকতা করছেন বহু মেধাবী ছেলেমেয়ে। না পোষালে মালিক ধরিয়ে দিচ্ছেন 'টারমিনেশন লেটার'। কারণ শিক্ষিত বেকারের অভাব নেই। দেশেও নেই। রাজ্যেও নেই। এতটাই অভাবনীয় ও অমানবিক হয়ে গেছে আজকের কাজের দুনিয়া। চাকরির জগতের এই বৈপ্লবিক রূপান্তরের দায় কার? অটোমেশন? নতুন নতুন প্রযুক্তি? এআই? নাকি আমাদের হিমশীতল নির্জীবতা? দিশাহীন আদর্শহীন রাজনীতি? আর আমাদের হাতে রইল কী? পেন্সিল? না। বিবর্তনের ধারায় মানুষ হিসেবে আমাদের পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে যুঝতে হবে, বেঁচে থাকে হবে, এবং অবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। কে করবে? আমরাই করবো। মানুষ একদিন না একদিন ঘুরে দাঁড়াবেই। এই বিশ্বাস নিয়ে আমাদের বেঁচে থাকার টিকে থাকার প্রকৃতিপ্রদত্ত রাস্তায় চলতে

হবে। প্রযুক্তিকে দেয়াল বানিয়ে তার গায়ে ঘুসি মারলে আঘাত উলটো দিকেই দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসে। বরং তাকে কাজে লাগিয়ে আমাদেরও যোগ্যতমের উদ্বর্তন নীতিতে আস্থা রেখে যাপনের এবং স্বপ্নের অভিমুখ বদলাতে হবে।

একুশ শতকের আড়াই দশকে পৌঁছে আমাদের মানতেই হবে যে, বর্তমান যুগের রথের রশি অবশ্যই তথ্যপ্রযুক্তির হাতে। এই যুগে আমাদের চারপাশ ঘিরে রয়েছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্যপ্রবাহ এবং স্মার্ট প্রযুক্তির নিরন্তর ব্যবহার। প্রযুক্তির এই প্রসারে আমাদের জীবনধারা যেমন সহজ হয়েছে, তেমনি সমাজ ও শিক্ষাক্ষেত্রে এক গভীর রূপান্তরের সূচনাও হয়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা হারিয়ে ফেলছি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ, যা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সমাজের ভিত ছিল। ভিতর-বাহির ছিল, যা থেকে আমরা দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলেও ঘুরে দাঁড়াতে পারতাম। অথচ আজ আমরা এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, যেখানে আমাদের শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক এবং সমাজের প্রত্যেকটি স্তরের মানুষের মস্তক নত হয়ে গেছে। বিনতি থেকে নয়, আদর্শ থেকে, নৈতিকতা থেকে। তাই আমাদের নড়াচড়া এখন আর খুব একটা চোখে পড়ে না। আমাদের উচিত নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনযাপন, জীবিকার্জন, স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন সব কিছুর পুনর্বিবেচনা করা। শিক্ষার উদ্দেশ্য তো শুধু চাকরি পাওয়া নয়, বরং মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা–এই বোধ ফিরিয়ে আনার এখনই সময়। তাই প্রযুক্তির পাশাপাশি আরও বেশি করে সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান (General Education) চর্চা করা উচিত। সভ্যতাকে বাঁচানোর এছাড়া আর কোনও পথ ও পন্থা আছে কিনা আমার জানা নেই।

তবু চলমান বিশ্বে ভেসে থাকতে হলে প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ এবং ডিজিটালাইজেশনের অগ্রযাত্রার সঙ্গে আমাদের মানিয়ে নিতে হবে। কেননা জীবনের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করছে ডিজিটাল প্রযুক্তি। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সমাজব্যবস্থা এবং মূল্যবোধ–সব কিছুই এই নব্য প্রযুক্তির অনুকূলে নতুন নতুন রূপ নিচ্ছে। এই পরিবর্তন যেমন আমাদের সুযোগ দিচ্ছে, তেমনি সৃষ্টি করছে নানান সংকটও। আমাদের শারীরিক ও প্রাতিস্বিক জগত এতটাই ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে উঠছে যে, আমরা মানবিকতা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ এই সকল সুকুমার বৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণ গুলিয়ে ফেলছি। তাই 'ধনধান্য'-র পাতায় তথাকতথিত 'শুভেচ্ছা বার্তা'র মাধ্যমে আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরতে চাই, যা আজকের শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের একটু অন্যরকম ভাবতে হয়তো সাহায্য করবে। বা করবে না হয়তো। কিন্তু কর্তৃপক্ষের তরফে অথবা কলেজের প্রৌঢ় অভিভাবক হিসেবে একটা দায় তো থেকেই যায়, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সত্যকথনের।

প্রথমত বলি, আমরা মানি বা না মানি, প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ডিজিটাল শিক্ষায় আমাদের উত্তরণ ঘটে গেছে। একে অস্বীকার করা জলকে জল না বলার সমান। প্রথাগত শ্রেণিকক্ষভিত্তিক শিক্ষা আজ আর একমাত্র পথ নয়। ইন্টারনেট, স্মার্টফোন, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম–এই সব কিছু মিলিয়ে এক নতুন ধারার শিক্ষাপোকরণ আজকের প্রজন্মের সামনে হাজির হয়েছে। গুগল ক্লাসরুম, কোর্সেরা, ইউডেমি, ইউটিউব, খান একাডেমি -- এই ধরনের বহু মাধ্যম আজ শিক্ষার্থীদের শিখতে সাহায্য করছে ঘরে বসেই। কেবল মাথায় রাখতে হবে এই সকল শিক্ষাপোকরণ আমাদের কেবলমাত্র তথ্যজ্ঞাপন করে মাত্র। প্রত্যক্ষ বা মুখোমুখি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে যে আবেগের আদান-প্রদান হয় বা তার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এক্ষেত্রে তা নেই। নীরস, অলসভাবে কেবল দেখে বা শুনে যাওয়ায় মগজ কিন্তু শাণিত হয় না। বরং নিজস্ব ভাবনা বা কল্পনাশক্তির বিকাশ ব্যাহত হয়। আর একটি প্রশ্ন হলো, এই ডিজিটাল শিক্ষা কি আমাদের মূল্যবোধ ও শৃঙ্খলা এবং সংযম যা জ্ঞানার্জনের জন্য যা অত্যন্ত জরুরী সেই শিক্ষা কি দিতে পারছে? এর উত্তর জটিল। যদিও ডিজিটাল শিক্ষা আমাদের তথ্যভাণ্ডার প্রসারিত করছে, তবুও ডিজিটাল শিক্ষা আমাদের মনে একাকীত্ব, একরোখামি, মনোসংযোগের অভাব এবং আত্মকেন্দ্রিকতার জন্ম দিয়ে চলেছে। এই সমস্যার

অক্ষরেখা ক্রমশ উর্ধমুখী। ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক জটিল সমস্যাও সৃষ্টি করছে। অতএব, আমাদের দায়িত্ব শুধু প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা নয়, বরং তাকে সঠিক দিশায় সংযমের সঙ্গে ব্যবহার করা যাতে পড়ুয়ারা মানবিকতাবোধ রহিত রোবটে পরিণত না হয়; কিম্বা তথ্য কেবল তার মগজ দখল না করে। সেই সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে যাতে সে পরিবার ও সমাজ এমনকি নিজের সঙ্গেও তার বিচ্ছিন্নতা না ঘটে।

দ্বিতীয়ত, সরকারি চাকরির প্রায় অবসান ঘটে গেছে। এবং কর্পোরেট দুনিয়ার বিকট হাঁ-মুখে আমাদের সময়, শ্রম, মানবতা মাত্রাছাড়াভাবে গ্রস্ত হয়ে পড়ছে। সমগ্র দুনিয়ার চিত্রটা প্রায় এক। কীভাবে এর মোকাবিলা সম্ভব তা আমাদের মননকে যেন সদা সক্রিয় ও ভাবিত রাখে। কারণ, কোনও জ্ঞানই ব্যক্তিগত নয়, তার চরিত্র কিন্তু সামাজিক। তাই ডিগ্রি বাগানো ও জ্ঞানার্জন যেমন এক নয়, সামাজিক দায় ঝেড়ে ফেলাও একটি সামাজিক অপরাধ। আমরা উভয়ত যেন সেটা মনে রাখি। বিগত দশকগুলোতে বিশেষত, আগের শতকে ছাত্রছাত্রীদের এক বড় অংশের স্বপ্ন ছিল একটি স্থায়ী সরকারি চাকরি। সেই স্বপ্ন আজ অনেকাংশে ম্লান। অধরা। অথবা বিনিময়যোগ্য। সরকারি চাকরির সংখ্যা এখন এতটাই সীমিত(মৃতপ্রায়ও বলা যায়) যে, প্রতিযোগিতা অত্যন্ত তীব্র। এমনকি সর্ব ভারতীয় ডাক্তারি পড়ার প্রবেশিকা পরীক্ষাও অর্থমূল্যে 'বাজারে' বিক্রি হয়েছে। আর তারই সুযোগ নিয়ে কর্পোরেট ও প্রাইভেট সেক্টরের হাতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্র দ্রুত গতিতে হস্তান্তরিত হচ্ছে। সেখানে ডিগ্রি বিক্রি হচ্ছে কোহিনূর তুল্য মূল্যে। সাধারণ মানুষ বা গাঁ-গেরামের পরিবারের মেধাবী ছেলেমেয়েরা আজ আক্ষরিক অর্থেই বঞ্চিত। বলা ভালো সরকারিভাবেই তাঁরা প্রতারিত। আজ আর এই সত্য অস্বীকার কোনও জায়গা নেই। পাশাপাশি চাকরি পাওয়ার ধরনও বদলে যাচ্ছে। এখন শুধু পরীক্ষায় ভালো করলেই হয় না, দরকার যোগাযোগ দক্ষতা, দলগত কাজের অভিজ্ঞতা এবং প্রযুক্তিজ্ঞান। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মানসিকতা এবং প্রস্তুতির পদ্ধতিতেও বড় পরিবর্তন আনতে হচ্ছে।

তৃতীয়ত, একুশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটা রমরমা ছিল। সরকারি চাকরি বা ভদ্ররকমের ব্যবসার কারণে তাঁদের হাতে ছিল অনেকখানি ক্রয় ক্ষমতা। তাঁদের একটা বড়ো অংশ আজ অবসৃত; অতঃ চাকরি সংকুচিত, অতঃপর বিক্রিত হওয়ায় তাঁদের ক্রয় ক্ষমতা কমতে থাকে; পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে সবরকম পণ্যের বিক্রয় মূল্য। এর ফলে ক্রমশ বাজার সংকুচিত হতে থাকে। ঘটতে থাকে মুদ্রাস্ফীতি। ডলারের দাম আকাশ ছুঁয়ে ফেলে। সবরকম ইন্ধনের দাম সাধারণ মানুষের গায়ে ছেঁকা দেয়। ফলে ডিজিটাল যুগে মধ্যবিত্ত শ্রেণি এক অদ্ভুত সংকটের মধ্যে পড়েছে। কিছুদিন আগেও যে জীবনযাত্রা তাঁরা বজায় রাখতে সক্ষম ছিল, এখন তা ক্রমশ নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। ডিজিটাল অর্থনীতি বড়ো বড়ো কর্পোরেট কুমির-হাঙরদের পেট আরও মোটা করছে। মফস্বল শহরের বাজারগুলি ছোটো হয়ে পড়ছে। তার জায়গায় কুমির-হাঙরদের মলে মলে ছড়াছড়ি। সেখানে চলছে এক প্রকার লুঠতরাজ। তাঁরা আরও শক্তিশালী হচ্ছেন; মরছে অতি দরিদ্র, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, স্বনির্ভর শ্রেণি এবং ছোট পেশাজীবীরা। হারাচ্ছেন পুরনো আর্থিক অবস্থান। হয়ে পড়ছেন ক্রমশ ভাতানির্ভর। ভাতা দিয়ে রাষ্ট্র তাঁদের যে অপমান করছে সেই বোধটুকুও তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন যথার্থ রাজনৈতিক সামাজিক দিশাহীনতার কারণে। বাজার সংকোচনের এই ধারা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর উভমুখী চাপ সৃষ্টি করছে। তাদের জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণ করাও অনেক সময় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। এর ফলে হতাশা, উদ্বেগ এবং মানসিক চাপ ও রোগ বেড়ে যাচ্ছে।

চতুর্থত, এই সার্বিক নৈরাশ্যই একমাত্র সত্য নয়; কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রচুর চাকরির সুযোগ তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো সেবা খাতে (Service Sector) কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি। এর মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য পরিষেবা, অ্যাপভিত্তিক বাড়ি বাড়ি খাদ্য পরিবহন, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরের অ্যাপভিত্তিক পরিষেবা। শিল্প-কলকারখানার (Manufacturing Sector) যুগের পর এবার বিশ্ব প্রবেশ করেছে সেবা খাতনির্ভর (Service Sector) অর্থনীতির যুগে। কারণ

শিল্পের শ্রমনির্ভর কাজ করে দিচ্ছে রোবটিয় ব্যবস্থা। অনেক কম সময়ে, অনেকের শ্রমের কাজ নিমেষে হয়ে যাচ্ছে রোবটের মাধ্যমে। তাই বড়ো বড়ো শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের চাহিদা প্রায় নেই বললেই চলে। পরিবর্তে অ্যাপনির্ভর পরিষেবার প্রভূত বিস্তার ঘটে চলেছে। এর সঙ্গে যুক্ত অর্থনীতিকে গিগ অর্থনীতি বলে। পরিষেবা প্রদানকারীকে বলে গিগ শ্রমিক। এছাড়া স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি, পর্যটন, আর্থিক খাত–এসব খাতে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা দ্রুত বেড়ে চলেছে। এই পরিবর্তন শিক্ষার্থীদের জন্য একদিকে যেমন নতুন সুযোগ, অন্যদিকে তেমনই নতুন চ্যালেঞ্জও বটে। কারণ এই বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ না করলে প্রতিযোগিতার বাজারে ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে হবে। কারণ, সেবা খাতে কাজ করতে হলে কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞান নয়, চাই দক্ষতা, আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা (emotional intelligence), গ্রাহকসেবার মনোভাব এবং আত্ম উন্নয়নের স্পৃহা। পরিষেবা মূলক চাকরিগুলোতে শোষণ-বঞ্চনা থাকলেও স্বনির্ভর হওয়ারও সুযোগ রয়েছে। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করলে কেবল সরকারি চাকরির আশায় দিন কাটালে আখেরে পড়ুয়াদেরই ক্ষতি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোরও উচিত এখন থেকে এই চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের অবহিত ও প্রস্তুত করা।

পঞ্চমত, ডিজিটাল বিশ্বে কর্মসংস্থানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। আজ ডিজিটাল দুনিয়ায় এমন অনেক কাজের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে যা দশ/পনেরো বছর আগে কল্পনাও করা যেত না। যেমন, ডিজিটাল মার্কেটিং, কনটেন্ট ক্রিয়েশন, ইউটিউব চ্যানেল, সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট, ফ্রিল্যান্সিং, অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট, গেম ডিজাইনিং, পেশাদার ফটোগ্রাফি, ফিল্ম মেকিং কোর্স, অভিনয়, ইত্যাদি। যত দিন যাচ্ছে এই ডিজিটাল দুনিয়ার প্রসার ঘটছে। বাড়ছে কাজের সুযোগ। নতুন নতুন ভাবনা, কল্পনা, উদ্ভাবনা, সেই সঙ্গে ডিজিটাল উপকরণের ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করতে পারলে সহজেই স্বনির্ভর কর্মসংস্থান করা অসম্ভব নয়। এই পেশাগুলোর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, এগুলোতে প্রবেশ করতে গেলে ডিগ্রির চাইতে দক্ষতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিক্ষার্থীদের প্রতি আমার আহ্বান, তারা যেন নিজেদের আগ্রহ ও দক্ষতা অনুযায়ী এই নতুন দুনিয়াকে গ্রহণ করে, এবং নিজের জন্য এক নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে তোলে।

শেষত, উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সকলকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আজ কিন্তু সত্যি সত্যিই উচ্চশিক্ষায় একাধিক সংকট আমাদের মন ও মননকে নিঃস্ব করছে। শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। গবেষণায় স্থবিরতা, পাঠ্যপদ্ধতির সাথে বাস্তব জগতের সংযোগহীনতা তৈরি করছে এক অস্থিরতা। সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান (General Education) চর্চা, গবেষণা ও আরও উচ্চতর গবেষণায় আমরা যদি নিয়োজিত না হই তাহলে একদিন এই সভ্যতা কিন্তু থমকে দাঁড়াবে। সম্পূর্ণ ভেঙে পড়তেও পারে। কেবল মাত্র দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা যদি আমাদের মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে তাহলে জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস-সাহিত্য ইত্যাদি মৌল বিষয়গুলি যদি আমরা চর্চা না করি বিশ্বপ্রজ্ঞা আমাদের অধরা থেকে যাবে। একটি জাতির মেরুদণ্ড গড়ে তোলে জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস-সাহিত্য -- এই সবের চর্চা। আমাদের কর্তব্য হলো এই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ঠিকঠাকভাবে সচেতন করা। আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার সংকট বহু দিক থেকে স্পষ্ট। অর্থের যোগান কমছে, গবেষণার পরিসর কমে যাচ্ছে, অযৌক্তিক অনৈতিহাসিক গালগল্পকে ইতিহাস বলে চালানো হচ্ছে। অন্যদিকে অনেক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেও উপযুক্ত কর্মসংস্থান পাচ্ছে না। আবার অনেকেই উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে না পেরে পড়াশোনা মাঝপথে ছেড়ে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের, উচ্চশিক্ষার শিক্ষক হিসেবে, একটি বড় দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্যবই নয়, জীবনের পাঠও শেখাতে হবে। তাঁদের শেখাতে হবে কীভাবে বাস্তব জীবনের চাহিদা বুঝে নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয়। শুধু ডিগ্রি অর্জন নয়, চাই সত্যিকারের শিক্ষিত মানুষ তৈরি করা।

সব শেষে একটি সংবেদনশীল ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। এই 'শুভেচ্ছা বার্তা' যখন লিখছি ততদিনে কাশ্মীরে পহলগাঁওয়ে পাকিস্তানী কিছু জঙ্গী ছাব্বিশজন নিরীহ পর্যটককে হিন্দু না মুসলিম জিগ্যেস করে করে কেবল পুরুষদের হত্যা করেছে। ঘটনাচক্রে পঁচিশজনই হিন্দু। একজন মুসলিম ঘোড়াচালক পর্যটকদের বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন। সমগ্র কাশ্মীরে

সাধারণ মুসলমান সমাজ বহু বছর পরে একটি সফল বন্ধ করেছেন সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাটিকে আমরা যেন নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে দেখি ও বিচার করি। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় যারা মারা গেলেন তাঁরা হিন্দু, যারা মারলেন তাঁরা মুসলমান -- এই সরল সমীকরণে ভাবলে একটি মারাত্মক ভাবনাকে আমরা প্রশ্রয় দিয়ে ফেলবো। যা আরও সন্ত্রাস ও প্রাণহানির সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে। আমরা মনে করি বৈজ্ঞানিক যুক্তিবুদ্ধি বলে, উপরোক্ত ঘটনায় মারা গিয়েছেন নিরীহ ভ্রমণপ্রিয় মানুষ। আর যারা মারলো তারা সন্ত্রাসবাদী। সন্ত্রাসবাদীদের কোনও ধর্ম হয় না। তাঁদের একটাই ধর্ম সন্ত্রাসের মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ -- যা মানবতা বিরোধী। তাদের এমন কোনও আদর্শ নেই যার জন্য এহেন প্রাণহানি ঘটিয়ে মহত্ব আদায় করা যায়। ফলে হিন্দু মরেছে বলে সকল ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষকে কাঠগড়ায় তুললে সেটা আর একটা সন্ত্রাসের জন্ম দেবে। তারই জন্য মুখিয়ে রয়েছে হিন্দু সন্ত্রাসীরাও।

এই লেখার মধ্যে দিয়ে ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-অভিভাবক সকলকেই বলছি, এই অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রাখুন। অযথা অন্যের কথায় বা গুজবে কান দেবেন না। সামাজিক মাধ্যমে ফ্যাক্ট চেক না করে কোনও মেসেজ ফরোয়ার্ড করবেন না; উত্তেজিত হবেন না, উত্তেজনা সঞ্চার করবেন না। মনে রাখলে ভালো, কোনও ধর্মই মানবনিধনের কথা বলে না। সকল ধর্ম ও ধর্মীয় দেবদেবীরা মানুষের ভাবনা-কল্পনার ফসল। এবং ধর্মচর্চা একান্ত ব্যক্তিগত। প্রতিষ্ঠানে বা সামাজিক ক্ষেত্রে তার চর্চা বাঞ্ছিত নয়। এতে জটিলতা ও বিরোধ বাঁধে। আজকের রাজনৈতিক নেতানেত্রীগণ মানুষকে বিভাজিত করে ক্ষমতাসীন হওয়ার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সেই কারণে আমাদের উচিত আরও বেঁধে বেঁধে থাকা। এটাই আমাদের ভারতাত্মার মর্মবাণী। এই সহজ কথাটা যেন আমরা ভুলে না যাই। সকল মানুষ অমৃতের সন্তান। আনন্দম।

কুন্তল হালদার, তৃতীয় সেমিষ্টার, (কেমিষ্ট্রি বিভাগ)

পুষ্পিতা সাহা, অশিক্ষক কর্মচারী

রাজেশ দাস, অশিক্ষক কর্মচারী

পহেলী বিশ্বাস, তৃতীয় সেমিষ্টার, (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)

তিথি ঘোষ, ষষ্ঠ সেমিষ্টার, (দর্শন বিভাগ)

মোনা বিশ্বাস

খুসবু মণ্ডল, প্রথম সেমিষ্টার, (বাংলা বিভাগ)

মাতৃ ভ্রম

আজিজা খাতুন (তৃতীয় সেমিষ্টার, দর্শন বিভাগ)

সে ছিল ছোট্ট ছেলে স্বপ্ন ছিল মস্ত বড়।
হবে সে অনেক বড়
তারপর সে স্কুলে গেলো পড়াশোনাও শেষ করলো
দিতে হলে SSC gd
দেখলো সে এক রূপবতী তার ও ছিল অনেক মেধা
দুজনের আলাপ হলো, কে যেনো বাড়িতে খবর দিলো
ছেলের মা অনেক রাগি খানিকটা বদ মেজাজি
বললো নেবো না ও মেয়ে ও মেয়ের বাপের নেই যে টাকা
ছেলে বলে সোনো মা আমার মেয়েটা অনেক ভালো
ওর ও আছে অনেক মেধা
একটি বার মোর দিকে ফিরে তাকা
মা গেলো দূরে সরে ছেলের থেকে অনেক দূরে
মেয়েটি দুঃখ পেয়ে গেলো যে ফাঁসিতে ঝুলে
ছেলে গেলো পাগল হয়ে
রূপবতীর্ কবরটি তখন তার ঘর হলো।
গেলো সে শেষ হয়ে চোখ দুটোও ফেলল হারিয়ে
এখন সে নিঃস্ব হলো
মা বলে কাল গেলো মোর ছেলে খেয়ে।

সোনা মা

আজিজা খাতুন, দর্শন বিভাগ (৩য় সেমিষ্টার)

মা তোর সোনা মুখটি কত দিন যে দেখিনা
মা তুই যে সবচেয়ে আপন
কেউ তো বোঝেনা
তোর মুখটি দেখলে যে মোর মুখে ফোটে হাসি
তোর জন্য বিনা দোষে নিতে পারি ফাঁসি
শত স্বপ্ন যে তোর আমাকেই ঘিরে
বুঝি সেটা আমি
তাই তো তোর স্বপ্ন পূরণের পথে
দিয়েছি আমি পারি।
ভালো আছিস সুখে আছিস
ফিরে যেন দেখি
মা তুই যে মোর দুটি চোখের আঁখি।

থেকে যাও

রিমন শেখ, দর্শন বিভাগ (৬ষ্ঠ সেমিষ্টার)

তুমি ছাড়া এ পৃথিবী শূন্য ও একাকিন।
তুমি ছাড়া এ পৃথিবী লাগে আমার অর্থহীন।

তুমি যদি চলে যাও যাবো আমি হারিয়ে।
যদি তুমি থেকে যাও যাবে এ জীবন আলোয় ভরে।
তুমি যে অন্য কারো ভাবতে আমি পারি না।
তোমায় ছাড়া একটা দিনও থাকতে পারি না।
তোমায় ঘিরে যত আশা তুমিই আমার ভালবাসা।
যদি তুমি দূরে যাও থাকবে না কোনো বাঁচার আশা।
তুমি স্বপ্ন তুমিই ভরসা।
তুমি ছাড়া নিঃস্ব আমি, থেকে যাও চিরদিন
তুমি ছাড়া কাটেনা কোনো শুভদিন।
এত করে বলছি যখন থেকে যাওয়া কি যায়না?
আসলে তুমি ছাড়া দিন কাটতে চায়না।
সব শেষে বলতে চাই বড্ড ভালবাসি তোমায়...।

কবিতা

তিথি মণ্ডল, দর্শন বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার

তুমি সুন্দর তুমি স্নিগ্ধ, তুমি হৃদয়ে অনুক্ত
নেশায় তুমি পেশায় তুমি ক্লান্তিতে তুমি মত্ত,
হাসিতে তুমি কান্নায় তুমি বেদনায় আছো লিপ্ত।
মোর অন্তরেরই প্রকাশ তুমি, ডায়েরির এই পাতায়
মনোভাষায় এই প্রকাশ তুমি, মোর হস্তলেখনী শিখায়।।
তুমি ছন্দিত, তুমি স্পন্দিত, তুমি লাঞ্ছিত বহু শব্দে
তুমি সৃষ্টি, তুমি দৃষ্ট, মোর পরান ছাপিত অর্থে,
মোর হস্ত লেখনে অঙ্কিত তুমি, প্রকাশিত অনুভবে
মুক্ত অর্থে যুক্ত থেকো চিরকাল মোর লব্ধে।।

যেদিন আমি থাকবো না

তিথি মণ্ডল, দর্শন বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার

যেদিন আমি থাকবো না আর, যাবো বিলীন হয়ে
আপন জনও পর হবে সব দুঃখ যাবে সয়ে।
মন বলে কিছু থাকবে না আর ভাবনাও খুঁটিনাটি
থাকবে শুধু ফেলে আসা স্মৃতি কয়েকটি।
সুখ আনন্দ থাকবে না, কোথায় আমি যাবো?
নতুন করে আবার আমি আপন কাকে পাবো?
কয়েক মুহূর্ত সকলে আমার পানেই চেয়ে থাকবে
কেউ কেউ আবার মন দুঃখে অঝোরে কেঁদে যাবে।
সকলের সাথে আড়ি করে হাসতে হাসতে আর,
যাবো আমি সাত সমুদ্র তেরো নদী পার।
থাকবো সেদিন স্মৃতি হয়ে ফ্রেমের মধ্যে ছবি হয়ে
আমার জীবনের প্রতিটা দিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে,
যেদিন আমার দেহকে সবাই ফুল দিয়ে ঢাকবে।
সেদিন আমি থাকবো না আর, সুখ - দুঃখ করে একাকার
ঘর, খাটিয়া আলমিরাটাও গোপনে যাবে কেঁদে
থাকবো শুধু গীতা, ভগবত, আর থাকবো বেদে।
চুপি চুপি হাসতে হাসতে যাবো শুয়ে শুয়ে
এই ভুবনই পর হবে মোর আপনগুলো নিয়ে।
সেদিন আমি থাকবো না আর আসবো না তো ফিরে,
হারিয়ে যাবো শত-লক্ষ-কোটি মানুষের ভিড়ে।।

নতুন ভোর

অনুষ্কা বিশ্বাস, তৃতীয় সেমিষ্টার (ইংরেজী মেজর)

অন্ধকারে ডুবে যাওয়া সমাজ
একদিন বদলে যাবে।
সমস্ত কুসংস্কারের পর্দা ভেদ করে,
প্রকৃত শিক্ষার আলোয়
চারিদিক ভরে উঠবে।
থাকবে না ধর্ম, রাজনীতি,
থাকবে না জাতপাত নিয়ে ভেদাভেদ।
থাকবে শুধু শিক্ষা, মানবতা।
আকাশে নতুন সকালের সূর্য উঠবেই একদিন
যেদিন মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়াবে।
একজোট হয়ে রুখে দাঁড়াবে
তথাকথিত সমাজের বিরুদ্ধে
সেদিন দূষিত সমাজটা বদলে যাবে।
কথাতে নয় কাজেও যেদিন
নারী পুরুষ একসাথে সমান অধিকার পাবে
সেদিন সমাজ বদলে যাবে।
শিক্ষিতরা যেদিন যোগ্য সম্মান পাবে
সবাই বুঝতে পারবে শিক্ষার মূল্য
সেদিন বদলাবে এই সমাজ।
নারীদের ভোগের বস্তু নয়
মানুষ হিসাবে যেদিন দেখতে শিখবে পুরুষ জাতি
সেইদিন বদলে যাবে সমাজ।
যেদিন কোনা ছাত্রের হাতে শিক্ষকদের মার খেতে হবে না,
সেদিন বলতে যাবে সমাজ।
যেদিন সৌন্দর্য নয়, টাকা নয়,
শুধুমাত্র শিক্ষাই হবে যোগ্যতার মাপকাঠি।
সেদিন বদলে যাবে সমাজ।
অসুস্থ বাবা মায়ের চিকিৎসা করাতে
যেদিন শিক্ষিত বেকারদের আর
রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হবে না।
সেদিন বদলে যাবে সমাজ।
সেদিন ঘুষ বলে কোনো কিছু থাকবে না,
থাকবে না কারোর সুপারিশ
সেদিন ঘুষ বলে কোনোকিছু থাকবে না,
থাকবে না কারোর সুপারিশ
সেদিন বদলে যাবে সমাজ।
হ্যাঁ আমরা পারবো, আমাদের পারতেই হবে।
তথাকথিত সমাজের বর্তমান ছবিটা বদলে দিতে।

মিসিবাব

মনালিকা বিশ্বাস
তৃতীয় সেমিষ্টার (দর্শন বিভাগ)

মিসিবাব আসিল বধূর বেশে
মউর মাথায় করে।
মিসকালো তার দৈহিক বর্ণ
মুগা শাড়ি পড়ে।
মৌরুসী হয়েছে মেসবার কাছে
দোদিত তবুও সকলে তাকে ঘিরে।
মনের ভাবনা মনে গেঁথে
মাদার গাছের তলায় এখন সে একলা বসে আজ।
মরণ তাকে দিচ্ছে ডাক
মাইয়ারে তুই নতুন রূপে সাজ।।

ভয় হয় মোর

আজিজা খাতুন
বি.এ. (তৃতীয় সেমিষ্টার) (দর্শন মেজর)

সাপে কাটা রোগের যেমন মিষ্টি লাগে ঝাল
বর্তমান সমাজের হয়েছে তেমন হাল
ভালো কথা মন্দ লাগে মন্দকে লাগে ভালো
জ্ঞানী গুনী ভেবে বলে সমাজের কী হোল?
দিনকে তারা রাত্রি ভাবে, রাত্রিকে ভাবে দিন
কেয়ামত আর আসতে বুঝি নেই কো বেশি দিন
ধর্মের কথা শুনতে মোদের লাগে নাকো ভালো,
অধর্মকেই ভালো লাগে, কেন যে এমন হলো।
অধর্মই আজ সঙ্গ মোদের ধর্মের সাথে আড়ি
তাই মনে হয় কেয়ামেতের নেইকো বেশি দেরি
মাকে আমরা মাম্মি বলি বাবাকে বলি পাপা
বাবা মা বলে ডাকে যারা তাদের বলি খ্যাপা
উল্টো চলা উল্টো বলা উল্টো চিন্তা ভাবনা
উল্টো পথের পথিক মোরা সোজা কথা সয়না
মধু কোদু খাওয়া সুন্নত এসব লাগে তেতো
বিড়ি সিগারেট মদ গাঁজা এগুলোই অমৃত
নারির মতো পুরুষ সাজে, পুরুষের মতো নারি
ভয় হয় মোর কেয়ামোতের নেইকো বেশি দেরি।

'আড্ডা'

শিনম মণ্ডল
প্রাক্তন ছাত্র, ইংলিশ অনার্স

চোখ বন্ধ করতে ভেসে ওঠে
পুরোনা দিনের রঙিন স্মৃতি
আমিও ছিলাম তারাও ছিল
ছিলো কিছু পড়ে খাম আর চিঠি।

সেই বিকেলগুলোতে আড্ডা হতো
দারুণ কিছু আলোচনা,
গল্পের পর গল্প চলত
সাথে চায়ের কাপের আনাগোনা।

কলেজের বেঞ্চে বসলেই
কতনা কথা থাকত সবার,
অপেক্ষা করতাম সূর্য ডোবার,
পিছু পরে যে থাকত বাড়ির ধ্যান
হতাম ব্যাগ গুছিয়ে হয়রান।

মায়াহীন ঘুম ভাঙল যখন
পিছনে তাকালাম যেই,
হাতে পেলাম এক শূন্য বিকেল
পুরোনো দিনগুলো আর নেই।

অতীতটা সেই থাকুক না থাকুক
জায়গাটা আর জমা কথাগুলো পড়েই থাকে,
পরিবর্তন চাই অটল সত্য
মাথায় তুমি বাঁধবে কাকে?

তুলে রাখতে হয় এখন আপসোসের আলমারিতে
না বলা, লুকোনো কথা সব আছে যত,
তবে চাইলেই আড্ডা জমানোই যায়।
পৃথিবীটা এখন বড্ড ছোটো।
পৃথিবীটা এখন বড্ড ছোটো।।

বকুলতলার মহোৎসব

কৃষ্ণকান্তি হালদার
(অশিক্ষক কর্মচারী)

বর্তমান যুগে বহু মানুষ বিশ্বাস করে হিন্দু দেবদেবীরা অবস্থান করেন বিশেষ কিছু বৃক্ষে। যেমন-আমাদের বহু পরিচিত তুলসী বৃক্ষ, বট, অশ্বথ এছাড়া নিম, বেল, বকুল এই শ্রেণীভুক্ত। বকুল বৃক্ষের সঙ্গে বৈষ্ণব সাধুদের এক নিবিড় সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বৈষ্ণব ভক্তদের স্মৃতি বিজড়িত একাধিক বকুল বৃক্ষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়ে সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রামের নাম পলাশীপাড়া। জেলা-নদীয়া, শিয়ালদহ লালগোল রেললাইনে পলাশী স্টেশনে নেমে বাস বা অটো ধরলে তিরিশ মিনিটে পলাশীপাড়া, জলঙ্গী নদীর তীরে সুন্দর একটি গ্রাম।

এই পলাশীপাড়াতে আছে একটি বকুল বৃক্ষ যে গাছে শুধুমাত্র ফুল হয়, ফল হয় না। যার তলদেশে গোলাকার শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো বেদি। বৃক্ষের গোড়ায় একটি ছোট্ট মন্দিরে আছে চৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের চিত্রপট। বর্তমানে এখানে অতি সুন্দর একটি রাধাগোবিন্দ মন্দির নির্মাণ হয়েছে। নিত্য সেবা, পূজা, বিকেলে ভগবত পাঠ, সন্ধ্যা আরতি প্রতিদিন চলছে। এই বকুল বৃক্ষের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাবা বৈষ্ণব গোঁসাইয়ের নাম। সবাই জয়ধ্বনিদেয়-'জয় বাবা বৈষ্ণব গোঁসাই'। এই বকুলতলা পলাশীপাড়া ও আশেপাশের গ্রামের প্রাণকেন্দ্র। যে কোনো শুভ আচার অনুষ্ঠান যেমন-বিবাহ, অন্নপ্রাশন, জন্মদিন সর্বপ্রথমে, বাবা বৈষ্ণব গোঁসাইকে প্রণাম, তাঁর কৃপা প্রার্থনা তারপর আরম্ভ। এই বকুল বৃক্ষের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একজন বৈষ্ণব সাধকের নাম। যেমন নীলাচলে সিদ্ধ বকুলের সাথে জড়িয়ে আছে হরিদাস ঠাকুরের নাম, কৃষ্ণনগর খানাকুল বকুল বৃক্ষের সাধকের সাথে জড়িয়ে আছে অভিরাম ঠাকুরের নাম, তেমনি পলাশীপাড়া বকুলবৃক্ষের সাথে জড়িয়ে আছে বাবা বৈষ্ণব গোঁসাইয়ের নাম। কিন্তু কে এই বৈষ্ণব গোঁসাইৎ কোথায় তাঁর জন্ম? কোথায় হল তার সাধনার স্থল? এ সমস্ত তথ্য আজও অজানা। কারও কারও মতে তিনি স্বয়ং নামাচার্য ঠাকুর হরিদাস, নামপ্রেম প্রচার করতে কিছুদিন এই স্থানে অবস্থান করেছিলেন। তিনিই বাবা বৈষ্ণব গোঁসাই। আমাদের কলিযুগের পাবন অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেই ছিলেন ব্রাহ্মণ সন্তান। তাই বৈষ্ণব চরিত্রকারেরা অনেক সময় তাঁকে চৈতন্য গোঁসাই বলে বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন। তাই বাবা বৈষ্ণব গোঁসাই বলতে কোনো বৈষ্ণব ভক্তের পরিচয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া বড়ো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

তবে তিনি ছিলেন একাধিক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, চৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপার ভাজন। এই জলঙ্গী নদীর তিরবর্তী গ্রামগুলি ছিল চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাক্ষেত্র। এই জলঙ্গী নদী হয়ে তিনি নৌকা যোগে তাঁর মামার বাড়ি অবিভক্ত বাংলা দেশের শ্রীহট্টে প্রায় যেতেন। এই নদীর তীরে আরও সুন্দর একটি গ্রাম আছে যার নাম চাঁদেরঘাট। সেখানে আছে সুন্দর একটি গৌর মন্দির। এই মন্দিরকে নিয়ে মহাপ্রভুর অনেক লীলাকথা প্রচলিত। সেসব কথা আমি এই প্রবন্ধে আনছি না, পরবর্তীতে লিখব।

পলাশীপাড়ায় বকুলতলায় যেসব বৈষ্ণবীয় উৎসব উদ্‌যাপিত হয় তার মধ্যে অন্যতম হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাস উৎসব ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, প্রভু নিত্যানন্দ রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে নামযজ্ঞ মহোৎসব। প্রতিবছর কার্ত্তিক

মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রাসমণ্ডপ সাজানো হয়। সাতদিন ধরে চলতে থাকে পদাবলী কীর্ত্তনের আসর অন্তে মালসা ভোগ ও প্রসাদ বিতরণ। বকুলতলায় সবচেয়ে জনপ্রিয় অতি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব পালিত হয় প্রতিবছর জৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে, শ্রীশ্রীনাম যজ্ঞ মহোৎসব (মচ্ছোব) বলে আখ্যায়িত। এই মহোৎসবের সাথে পলাশীপাড়া বাসীর আবেগ, ভক্তি, শ্রদ্ধা জড়িয়ে আছে। মানুষ মুক্ত হস্তে এই অনুষ্ঠানে দান করে। শত শত রোগাক্রান্ত বিপদগ্রস্ত মানুষ পরম ভক্তি ভরে এই বকুলতলার মাটি মাথায় তুলে নেয় বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রত্যাশায়। মানুষ রাত্রি থাকতে জলঙ্গী নদীতে স্নান করে সিক্ত বস্ত্রে দন্ডি কাটতে কাটতে এক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে বকুলতায় পৌঁছায় তাদের মনোকামনা পূরণের জন্য। এই অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র হিন্দুরা নয়, সমস্ত জাতির লোকেরা ভক্তি ভরে অংশগ্রহণ করে। পলাশীপাড়ার বেশিরভাগ মানুষ এই চারদিন নিরামিষ আহার গ্রহণ করেন। অষ্টপ্রহর ব্যাপী হরিনাম সংকীর্ত্তন শেষ হলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নামে দেওয়া হয় মালসা ভোগ। বকুলতলার বেদির ওপর মাটির পাত্রে সাজানো হয় মালসা। যার সংখ্যা দাঁড়ায় সাত থেকে দশহাজারের মধ্যে। প্রতিটি মাটির পাত্রে থাকে ভিজে চিড়ে, ক্ষীর, ছানা, ঘি, মধু, বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন সহ ফল। বাবা বৈষ্ণব গোঁসাইয়ের কৃপায় এমন সুস্বাদু প্রসাদ তৈরী হয় যা গ্রহণ না করলে বোঝা যাবে না। অপরদিকে চলতে থাকে খিচুড়ির ব্যবস্থা। সারি সারি বিশাল আকারের উনুন, রান্না কারর জন্য বিশেষ প্রকারের কড়াই তৈরি থাকে। রান্না হয়ে গেলে বড়ো বড়ো চৌবাচ্চায় তা সংরক্ষিত করে। তার সঙ্গে থাকে তরকারি, চাটনি। সেদিন পলাশিপাড়া বাজার বন্ধ থাকে। বিশেষ বিশেষ ভক্ত একত্রিত হয়ে বিনা পয়সায় লাড্ডু, বোঁদে, ছোলা, মুড়ি, মিষ্টান্ন, বিভিন্ন প্রকার ঠান্ডা পানীয় বিতরণ করে। আশেপাশের গ্রামের প্রচুর ভক্তের সমাগম হয় এই বকুলতলা প্রাঙ্গণে। দ্বিপ্রহরে প্রায় দুই থেকে তিন ঘন্টা চলে ভজন আরতি অন্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ তারপর খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ। কোনো উচ্চনীচ ভেদ থাকে না। সকলে মাটিতে বসে ভক্তি ভরে এই প্রসাদ গ্রহণ করে। প্রসাদ বিতরণ অন্তে সমাপ্তি ঘটে এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের।

তাই সকলের কাছে নিবেদন করি একবার আসুন নিজের চক্ষে দেখে এই উৎসবকে উপভোগ করুন ও মহাপ্রসাদ গ্রহণ করুন। মানবজীবনকে ধন্য করে তুলুন। উৎসবের অন্তে প্রতিটি মানুষের মনে মিশে থাকে সেই হরিনাম।

ভজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধা গোবিন্দ

প্রতিবাদের ভাষা বাংলা

সুরাইয়া সুলতানা
সহকারী অধ্যাপক (ইংরাজী বিভাগ)

মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমকেই সাধারণত ভাষা বলা হয়। দার্শনিক ও সাহিত্যিকরা ভাষা সম্পর্কে বিভিন্ন মতপোষণ করেন। ফরাসী দার্শনিক জ্যাকস্ দেরিদা শব্দ ও শব্দগুচ্ছের বহুবিধ ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে বলেন যে, Language ambiguous and treacherous. তথাপি দৈনন্দিন জীবনে ভাষার, বিশেষত মাতৃভাষার অবদান অনস্বীকার্য, সাধারণভাবে বলা হয় যে বাংলাভাষা শ্রুতি মধুর, সাহিত্যিক ও নান্দনিক সৌন্দর্য প্রকাশের এক অভূতপূর্ব মাধ্যম। কবি অতুল প্রসাদের কথায়, 'মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা'। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের জাতীয় সংগীত 'জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে' বাংলাভাষাতেই রচনা করেন। সুমধুর ভাষা হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ভাষার প্রতিবাদী রূপ তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন পূর্ববঙ্গের ছাত্রসমাজ, বুদ্ধিজীবী ও 'আমজনতা', পুলিশের গুলিবর্ষণে আহত ও নিহত হন বহুজন। তাঁদের সেই সংগ্রামের ফলস্বরূপ পরবর্তীতে বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে। Unesco এই বিশেষ দিনকে (২১ ফেব্রুয়ারি) মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা (২১ ফেব্রুয়ারি) মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতার প্রাক্কালে ও পরবর্তীকালে বিভিন্ন গণ আন্দোলনের সূচনা হয় বাংলা ভাষা তথা বাংলা, সাহিত্য সম্ভারের মধ্যে দিয়ে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করার পর থেকেই বাঙালি কবি ও লেখকরা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন,

বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক হে ভগবান।

এই গানটির মধ্য দিয়ে জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কবির স্বদেশপ্রেম প্রকাশিত হয়। তাঁর এই গান ছিল বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে বাঙালি জনমানসকে একসূত্রে বাঁধার রূপরেখা।

পরাধীন ভারতবর্ষে আরো এক কবি নজরুল ইসলাম সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে এবং মানুষের হাতে মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে ধিক্কার ও তীব্র নিন্দা জানান তাঁর কবিতা ও গানের মধ্য দিয়ে। বাংলাভাষায় রচিত সেইসকল কবিতা আজও হৃদয়স্পর্শী। নজরুল ইসলামের রচিত 'বিদ্রোহী', 'মানুষ', 'নারী' ইত্যাদি কবিতাগুলির একাধারে কবির সৃজনশীলতা ও অন্যধারে প্রতিবাদী সত্তা ফুটিয়ে তোলে।

বল বীর---
বল উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমারি,
নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রীর (বিদ্রোহী)

তাঁর কবিতাগুলি সাম্য, মৈত্রী ও মানুষের স্বাধীনতার পক্ষে আজীবন সাওয়াল করে।

নজরুল ইসলামের ভাষায়,

"সাম্যের গান গাই--
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"
-নারী কবিতা

বাঙালি কবি মধুসূদন দত্তের কবিতাগুলিও বাংলা ভাষায় রচিত এক অনবদ্য সৃষ্টি। তিনি জীবনের প্রথমদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাতের ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হলেও পরবর্তীকালে মাতৃভাষার সৌন্দর্য্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তার এই ভাবনা লেখার মাধ্যমে সুন্দরভাবে বিকশিত হয়েছে।

'আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাবো কেমন?" (আত্মবিলাপ')

ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বাংলাভাষায় গান ও কবিতা লিখে কৃষক সমাজে প্রভাব ফেলেছিল যে গীতিকার, তাঁর নাম সলিল চৌধুরী। সামন্ততন্ত্রের অধিকার খর্ব কারার উদ্দেশ্যে ও নিজ পরিশ্রমের ফসলের ওপর মালিকানার দাবীতে কৃষকরা শুরু করেন তীব্র লড়াই। সলিল চৌধুরির গান বাংলার শ্রমজীবী মানুষের চেতনার মূলমন্ত্র ছিল।

হেই সামালো হেই সামালো
হেই সামালো ধান হো, কাস্তেটা দাও শান গো
জান কবুল আর মান কবুল
আর দেব না আর দেব না
রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো....

মূলত বিদ্যাধরী নদীর ত্রাণকাজে তিনি যুক্ত ছিলেন এবং বাংলার কৃষকদের দুঃখ দুর্দশা তিনি খুব কাছ থেকে অনুধাবন করেছিলেন। তাঁর গান কৃষকদের সংগ্রামী মানসিকতার পরিচয় বহন করে।

'সবশেষে বলা যায় যে, বাংলাভাষার বিবিধ সাহিত্যসম্ভার বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় বাংলা ভাষার প্রতিবাদী ও বলিষ্ঠ সত্তা। ২১ ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলন বাংলার জনসাধারণের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি জোগায় বাংলা ভাষা যে তুচ্ছ নয়, বাংলাভাষার কবিতা, গান, যে ভাবে বাঙালির প্রতিরোধ স্পৃহা জাগিয়ে তোলে, তার প্রভাব ব্যাপক ও সুদুর প্রসারী। বাংলা ভাষার মাধ্যমে বাঙালিরা শিখেছে কিভাবে জাতির স্বার্থে একত্রিত হয়ে লড়াই করতে হয়। এই বিশ্বায়নের যুগে, প্রযুক্তির উন্নতির পাশাপাশি মাতৃভাষা যে মানুষের ভাবাবেগ ও গভীর চেতনার পরিপূরক সেকথা অনস্বীকার্য। সেই অর্থে মাতৃভাষা হল মানুষের প্রতিবাদী রূপ প্রকাশের এক স্বতঃস্ফূর্ত মাধ্যম। একমাত্র মাতৃভাষাই পারে বহু দুর দুরান্তের মানুষগুলিকে একসুতোয় অনায়াসে বেঁধে ফেলতে।

Empowering Women and Improving Social Indicators

Srijita Roy, Ex-Student (Dept. of English)

Women Empowerment' is not just a phrase.It is an important element for the progress and humanity of society.Empowerment of women refers to equipping women with tools, autonomy and opportunities to make life determining decisions. Through education, employment, equal rights and improving social indicators women can contribute to society as effectively as the men. Historically, women were relegated to the background with limited opportunities and rights for growth. Although, the current scenario is quite different from then.Many women find the true light of freedom and empowerment though some are neglected because of some barriers and customs. When talking about girls' empowerment and women as well, we will often get to hear that we are helping women to find their voices, I actually fundamentally disagree with the statement.Women do not need to find their voice. They needa dose of encouragement and nothing more from the family and society. Empowering Women is essential for achieving holistic development and creating the ideal society that we dreamt India is making strides to bridge gender gaps and uplift social indicators, women empowerment can improve social indicators in a number of Increasing women's educational attainment contributes economic growth. Women's economic empowerment can increase economic diversification and income equality. It can also help to close the gender gap in the world of work. We have to include recognising and valuing unpaid care and domestic work. This can be achieved through public services, social protection policies and infrastructure. We have to foster gender equality in all the fields.At first, we have to make the families understand that men and women are equal. Without getting any support from family it would not be possible for anyone to stand. Society thinks that women dont have any voice and they are not capable of making decisions. The study, which was published this week in the International Journal of Business Governance and Ethics, showed that women are more likely to consider the rights of others and to take a Co-operative approach to decision-making. But the root cause of many societal issues lies in the collective mindset, beliefs, and perspectives held by the majority of people within that society. Often including biases, prejudices, or outdated thinking patterns that hinder progress and perpetuate problems. If we encourage them, we will be able to form a progressive society. The historic 33% reservation for women legislative bodies marks a transformative step toward ensuring their representation and decision. In India, women have made significant achievements in various fields, but there has yet to be less progress in political empowerment. There was a need for special political interventions to ensure equal representation of women in Indian politics, as female representatives felt marginalized. Steps like the Women

Reservation Bill are necessary to address socio-political barriers that interrupt women's equal representation in the Indian socio-political system. The action is necessary to improve the status of women in Indian society.

Although reservation alone cannot completely pluck up India's deeply ingrained gender bias, it is a vital measure to bring change and ensure equality.

If we compare the contribution of women in various professions with history, we can see that today their contribution is much greater. As of March 2023, there were six thousand nine hundred ninety three women officers in the Indian Army, seven hundred forty eight in the Indian Navy. The number of women officers in the Indian Air Force stood at one thousand six hundred thirty six, excluding medical staff. India has the highest proportion of female pilots in the world, making up 15% out of a total of about ten thousand pilots in the south Asian country, against 5% globally. Female participation with 62.9%, agriculture has the highest percentage of women workers, followed by manufacturing, at 11.2% in 2022. We can foster gender equality by education, equal salary for equal work, gender equality training, awareness and capacity building, rejecting chauvinist and racist attitudes. We can not solve the problem in a short period of time. But if we try to help our surroundings to understand that women are not other creatures rather than a human being like men, We'll definitely succeed in achieving the goal. Helping girls learn advocacy skills at all stages of life so that they can use their voices effectively for their own rights.

Women had few rights in the 19th century. They could not own property, could not vote, did not have legal rights to their children, could not work outside the home, and were generally controlled by their husbands. Women's roles in the 19th century were encompassed by the domestic sphere. They were largely in charge of domestic duties, such as raising children and housework, and were confined to their homes, while men participated in public duties, such as politics and commerce. But now people are learning to think in a different way. Today women are making India proud by bringing medals and trophies in various fields. Actually it is the opportunity that is needed. If men and women get the same opportunities in the same field it'll be easier for us to build a society where every individual can thrive. If women and men are included in every project in equal ratio it'll be easier. If we do the things in that manner they should have done, we will definitely succeed in contributing to a stronger and more inclusive India.

Grow Up with me like a Plant

Suraiya Sultana
Assistant Professor of English

Grow up with me like a plant,
Wind comes, Rain Comes,
Comes a Sunny Day.
In the journey of life
Why don't you be gay ?

Grow up with me like a plant,
Who lives under the azure sky;
And survives in the bank of a river.
Never mind weeds and creepers,
Either be they cunning or clever !

ঘটক মশাই

মুসকান রহমান, বি.এ., তৃতীয় বর্ষ, (বাংলা বিভাগ)

শুনুন শুনুন ঘটক মশাই ছেলের দেবো বিয়ে
রূপে গুনে সেরা দেখে দেখুন একটি মেয়ে,
গায়ের রং ফর্সা হবে, কেশ ভুরু তার কালো
বিদ্বান, সুশীলা হবে চলন বলন ভালো,
বক্ষদেশটা চওড়া হবে, কোমর হবে সরু
গঠন-গাঠন সুন্দর হবে একটু মোটা উরু।
চোখ দুটো তার পটল চেরা কাজল কালো ভুরু,
নাক যেন তার টিয়ার ঠোঁট, দারুণ লম্বা সরু,
দুধে আলতা গায়ের রং, ঘন লম্বা কেশ
রূপের বর্ণনা করে হয় না যেন শেষ।
ঘটক মশাই বলে এবার শুনলাম সব ভালো
পাত্রের বর্ণনা একটু নিজের মুখেই বলো,
একমাত্র পুত্র আমার, তিন তলা বাড়ি
বিশ বিঘা জমি আছে, চারখানা গাড়ি,
মানসম্মান খ্যাতি আমার আছে দেশ জোড়া
দশ সমাজের কোনো কাজই হয় না আমায় ছাড়া,
ঘটক এবার বলে মশাই বুঝলাম সব ভালো
দেনা পাওনা থাকে যদি তবে কিছু বলো।
ছেলের বিয়েতে আমার কোনো দাবি নাই
না চাইতেই অনেকে এক কোটি দিতে চায়।
আরো দেবে খাট, আলমারি, সোফা আর আয়না
চার চাকা গাড়ি দেবে, দশ ভরি গয়না।
এই তার মেয়েকে দেবে, আমি কিছু চাইনা,
এসব শুনে ঘটক মশাই বলল কথা চাঁচা
ঘটকালি করি আমি, করিনা মানুষ কেনা-বেচা।

While Learning an Unfinished Work

–Nisan Mondal, Ex. Student, Department of English

"Imagination" and "Dream" these are two creation of mind; both have our whelming expectation over circumstances of material world. It is material obsession to imagine but not materid gain. When colour and matters are arranged in aesthetic order to give mental calmness is called Imagination.

Matters which are having form present is nature, are natural phenomenon, an unavoidable and primary ingredient of inagination. It is not memory for memory have direct connection with happenings of external world, rather it contains pure expectation of internal aesthetics.

Dream, somehow, is opposite of Imagination having desire of gain and possibilities. It's direction of moving forward is regulated and affected by effects of past and doings of present. Dream is fragile it's an expectation.

Collides with everchanging realities making a pause to it's linear path. This collision gives birth two different products, one is anger and another is Fear of Missing Out or **FoMo.**

TEACHING STAFF

FACULTY OF ARTS

DEPARTMENT OF BENGALI :

1. Dr. Sibsankar Pal (M.A, Ph.D.) Associate Professor & Officer-in-Charge
2. Dr. Nitish Ghosh (M.A, Ph.D.), Assistant Professor & Head of the Department
3. Dr. Shubhadip Debnath (M.A, M. Phil., Ph. D.) Assistant Professor

DEPARTMENT OF ENGLISH :

1. Saidul Haque (M.A, M. Phil., Pursuing Ph.D), Assistant Professor & Head of the Department
2. Suraiya Sultana (M.A., Pursuing Ph.D.), Assistant Professor.

DEPARTMENT OF HISTORY :

1. Gopal Mandal (M.A, B.Ed.), Assistant Professor & Head of the Department
2. Pallabi Chatterjee (M.A, Pursuing Ph.D.), Assistant Professor
3. Dr. Prayana Subba, (M.A., M.Phil, Ph.D.) Assistant Proffessor

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY :

1. Moumita De (M.A, M. Phil.), Assistant Professor & Head of the Department
2. Md. Najir Hossain (M.A, Pursuing Ph.D.), Assistant Professor
3. Priya Tudu (M.A, M. Phil., Pursuing Ph.D.), Assistant Professor

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE :

1. Muklesur Momin (M.A., M.Phil, Pursuing Ph.D.) Assistant Professor & Head of the Department

FACULTY OF SCIENCE

DEPARTMENT OF PHYSICS

1. Dr. Jyotirmoy Maiti (M.Sc., Ph.D.), Assistant Professor & Head of the Department
2. Dr. Bhaskar Das (M.Sc., Ph.D.), Assistant Professor
3. Dr. Ajoy Mandal (M.Sc., Ph.D.), Assistant Professor
4. Dr. Sumit Kumar Das (M.Sc., Ph.D.), Assistant Professor

DEPARTMENT OF CHEMISTRY :

1. Dr. Sanjoy Satpati (M.Sc., Ph.D.), Assistant Professor & Head of the Department
2. Dr. Ramij Raja Mondal (M.Sc., Ph.D.), Assistant Professor
3. Susmita Chowdhury (M.Sc., Pursuing Ph.D.), Assistant Professor

DEPARTMENT OF MATHEMATICS :

1. Dr. Supratim Mukherjee (M.Sc., Ph.D.), Assistant Professor & Head of the Department
2. Dr. Haridas Biswas (M.Sc., Ph.D.), Assistant Professor
3. Dr. Md. Abul Kashim Molla (M.Sc., Ph. D.), Assistant Professor

LIBRARIAN

Gouranga Mondal
(M.Sc., M.Lib. & I.Sc.)

NON-TEACHING STAFF

OFFICE STAFF :

1. Rajesh Das (Cashier)
2. Sk Nasir (Office Peon)
3. Maitra Sarder (Night Guard)
4. Subrata Halder (DEO)
5. Debabrata Mondal (DEO)
6. Puspita Saha (DEO)

SECURITY GUARD :

1. Krishna Kanti Halder
2. Sankar Kumar Biswas
3. Sadhan Bairagya
4. Sarthak Dutta

KARMABANDHU :

1. Sarthak Dutta
2. Nepal Halder

NAAC ভিজিটের কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৫-এর কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত

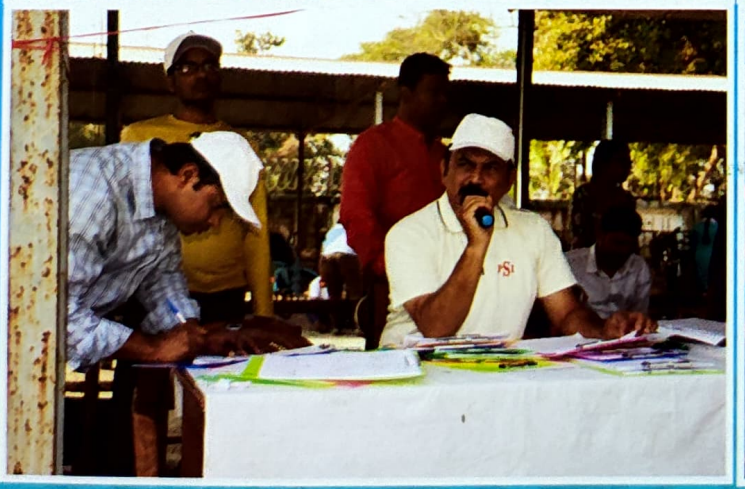

বার্ষিক পত্রিকা
ধনধান্য
শিক্ষাবর্ষ ২০২৪-২০২৫

গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, তেহট্ট
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. শিবশংকর পাল কর্তৃক মহাবিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত
মুদ্রণে ঃ আর্ট প্রেস, রানাঘাট, নদিয়া ● মুঠোফোন ঃ ৯০৬৪৭৫৭২২১